দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

৩৩ ভাগ স্কুল শিশু ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে ঝরে পড়ে

৫৫ ভাগই অপুষ্টির শিকার ॥ টিফিন কার্যক্রম পরিবর্তন আনতে পারে

॥ নিজামুল হক ॥

"যখন ক্ষুধা লাগে তখন স্যারের কথা শুনতে ভালো লাগে না, পেট ভরা থাকে তখন সবই ভাল লাগে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছা করে" দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রহিমার এ উক্তিগুলোই বুঝিয়ে দেয় শিক্ষার জন্য খাদ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলে কেমন সময় কাটে এমন প্রশ্নের জবাবে রহিমা আরো জানায়, "কখনও পানি ভাত বা রুটি খেয়ে, কখনও না খেয়ে স্কুলে যাই। দুই ক্লাসের পরই ক্ষুধা লাগে। তখন স্যারের কথা শুনতে ভালো লাগে না, লেখাপড়ায় মন বসে না, ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে।" দেশের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের অবস্থা এমনই। এখনও ৯০ লাখ স্কুল বয়সী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। আর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ৪৮ শতাংশ ছেলেমেয়ে পঞ্চম শ্রেণী শেষ করতে পারে না। স্কুল টিফিন বা স্কুলে একবেলা খাবারের কার্যক্রম না থাকায় এ অবস্থা বিরাজ করছে- অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ওই সব শিশুদের মধ্যে ৫৫ ভাগ শিশু সরাসরি অপুষ্টির শিকার। এছাড়া ৫৬ শতাংশ শিশুর শরীরের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ পুষ্টিহীনতার কারণ ভিটামিন-এ, আয়রণ এবং আয়োডিনের অভাব। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা এই দীর্ঘ সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্কুলে থাকতে হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে না খেয়ে থাকার ফলে শিশুদের অপুষ্টিসহ স্বাস্থ্যহানি ঘটছে প্রতিনিয়ত। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা এসব শিক্ষার্থীরা অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত অবস্থায় থাকে। এর ফলে দীর্ঘ সময়ে ক্লাসে আসা তাদের জন্য কষ্টকর। যারা ক্লাসে আসে তারা অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির কারণে তাদের শেখার ও মনে রাখার ক্ষমতা দুটোই কমে যায়। এ কারণে শিক্ষার গুণগত (১৯শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

৩৩ ভাগ স্কুল শিশু

(২০শ পৃঃ পর)

মান অর্জনও সম্ভব হচ্ছে না।

বেসরকারি এক গবেষণায় দেখা যায়, ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৩ শতাংশ এবং ৪৩ শতাংশ এবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই থেকে ঝরে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার উপযোগী শিশু দরিদ্রতার কারণে স্কুলে যায় না। অধিকাংশ শিশুই মওসুম ভিত্তিক শিশু শ্রম, রোজগারের মাধ্যমে পিতামাতাকে সংসার চালাতে সহায়তা করে। যা তাদের পরবর্তী পেশা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পেশা আর ভাগ্য কোনটিরই পরিবর্তন হয় না।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই স্কুলে একবেলা খাবারের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এ প্রকল্প চলছে। মালয়েশিয়ায় দরিদ্র পরিবারের জন্য স্কুল টিফিন বাবদ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। ব্রাজিলে স্কুল ক্যাম্পাসেই শাক-সবজি উৎপাদন করা হয়, যা খাদ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় বাংলাদেশের ৯টি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলায় ৪ হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিস্কুট প্রদান করছে। ডব্লিউএফপি'র সাহায্যে বর্তমানে শুধু ১ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল টিফিন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড রিসার্স ইনস্টিটিউট এবং টাফট ইউনিভার্সিটি এইডের পৃথক দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, এ খাদ্য গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার কমে গেছে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আওতায় ২০০১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলায় যে কার্যক্রম চালানো হয়, তাতে ৭৫ গ্রাম ওজনের বিস্কুট প্রতিটি শিশুকে দেয়া হতো, যা তাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার ৭৫ ভাগ মেটাতো। এর ফলে ওই স্কুলগুলোতে ভর্তির হার বেড়েছে ৮ দশমিক ৯ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির-২ এর হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে শিশু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ৩৫ ভাগ থেকে কমে ৩০ ভাগে নেমেছে।

পিপিআরসির এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, যেহেতু ওইসব স্থানে পুষ্টি যোগান দেয়া হয়েছে তাই ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি মনোযোগী ছিল। শিশুরা ভিটামিন এ এবং আয়োডিনের অভাবে যেসব রোগে ভুগত তা দূর হয়েছে। পড়াশুনা ও খেলাধুলায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সাময়িক স্কুল ত্যাগের প্রবণতা কমছে এবং দরিদ্র পরিবারের ওপর থেকে আর্থিক চাপ কমছে। ২০০০ সালে ওই স্কুলগুলোর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার ছিল ৩৮ দশমিক ২ ভাগ। ২০০৪ সালে এটি উন্নীত হয়েছে ৬০ দশমিক ৯৭ ভাগে। সরকার অনুমোদিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) স্কুল কার্যক্রমের একটি সম্ভাব্য হিসাব দিয়ে বলা হয়েছে, যদি প্রাথমিক শিক্ষায় খাদ্য কার্যক্রম ভালভাবে চলানো যায় তাহলে শিক্ষার মান উন্নয়ন তো বটেই, একই সঙ্গে তা পুষ্টি সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, স্কুল টিফিন অনিবার্যভাবে দরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কুল টিফিন ব্যবস্থা চালু আছে। শিশুরা সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের জন্য খাবার দরকার। তিনি বলেন, দেশের দরিদ্র পরিবারের শিশুরা এমনিতেই ঠিকমত খাবার পায় না। কেউ কেউ দিনে একবার খাবার খেতে পারে। তাদের জন্য স্কুলে খাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ওই খাবারটুকুর জন্য তারা হয়তো স্কুলে আসতে চাইবে। স্কুল টিফিন কার্যক্রমের ফলে শিশুর শারীরিক বিকাশ এবং মেধা ও যোগ্যতা বাড়বে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের যুগ্ম পরিচালক চৌধুরী মুফাদ আহমদ বলেন, প্রাইমারি স্কুলে টিফিন কার্যক্রম চালু করা জরুরি। এ খাতে প্রাথমিকভাবে আর্থিক খরচ বেশি হলে তা দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ হবে।